Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 57
January-March, 2019

Article Review : প্রবন্ধ পর্যালোচনা

ফিকহ ও ফিকহের মূলনীতি*

Sayed Mohammad Jahirul Haque

প্রথম

যে শাস্ত্রের মাধ্যমে (শরীয়তের বিধিনিষেধ পালনে) আদিষ্টদের (মুকাল্লাফ) কার্যকলাপ সম্পর্কিত আল্লাহর বিধিবিধানের মর্যাদা ও অবস্থান অর্থাৎ সেটি ওয়াজিব (অপরিহার্য), হারাম (নিষিদ্ধ), মানদুব (পছন্দনীয়), মাকরূহ (দূষণীয়) কিংবা মুবাহ (গ্রহণযোগ্য) ইত্যাদি জানা যায় তাকে ফিকহ বলা হয়। এসব বিধিবিধান কিতাব ও সুন্নাহ এবং শরিয়তের সেসব উৎস থেকে গৃহীত হয় যা শরিয়তের প্রবর্তক রাসূল স. সমর্থন ও সাব্যস্ত করেছেন। পূর্ববর্তী ইসলামী মনীষীগণ বিধিবিধান এসব উৎস থেকেই উদ্ভাবন করেছেন এবং এটা করতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ ও মতভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এ মতবিরোধ ও মতভিন্নতা ছিল অপরিহার্য। কারণ, শরিয়তের বিধিবিধানের যে মূলনীতি ও বিধানজ্ঞাপক শব্দ কুরআনে বিদ্যমান তা আরবি অভিধানেও রয়েছে এবং বহুবিধ অর্থের ধারক-বাহক। বস্তুত অর্থের এ বিভিন্নতার দরুন ইমামগণের মধ্যেও মতবিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে। সুন্নাহর অবস্থাও অনুরূপ। কারণ, সেগুলোও বহুসূত্রে বর্ণিত এবং অধিকাংশ পরস্পর সাংঘর্ষিক। এ কারণে অপরিহার্যভাবে সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

বস্তুত এখান থেকেই মতভিন্নতার সূত্রপাত হয়। এসব বিষয় বাদ দিলেও পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হতেই থাকে। সেগুলোর ব্যাপারে কুরআন-হাদিস থেকে সরাসরি তেমন কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না। ফলে বাধ্য হয়ে নজির ও তুলনার মাধ্যমে সেগুলোকে 'নস'-এর পর্যায়ভুক্ত গণ্য করতে হয়। ফলে এখান থেকেও মতভিন্নতার পথ খুলে যায়। আর এভাবেই পূর্বসূরী মনীষীবৃন্দও বিভিন্ন

* আল্লামা ইবনে খালদুন তাঁর বিখ্যাত রচনা আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে ফিকহশাস্ত্র ও তার মূলনীতি বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। ইবনে খালদুনের এ আলোচনাটি জ্ঞানীজনদের কাছে ফিকহ শাস্ত্র এবং এর ইতিহাসের ওপর একটি প্রামাণ্য ও দালিলিক আলোচনা হিসেবে গণ্য এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত এটি প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর এ প্রবন্ধটি রিভিউ করেছেন সৈয়্যেদ মোহাম্মদ জহীরুল হক। – সম্পাদক

মত ও পথের অনুসারী হয়েছেন। পরবর্তীতে মুজতাহিদ ইমামগণও স্বাভাবিকভাবে এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।

দ্বিতীয় : ফিকহ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্তন : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও সবাই ফতোয়া দানের অধিকারী ছিলেন না। তেমনি সবার কাছ থেকেই দীনের শিক্ষা গ্রহণ করা হত না। বরং দীনের শিক্ষকগণ কুরআনের বিশেষ ধারক ছিলেন। তারা নাসেখ ও মনসুখ, মুতাশাবিহ ও মুহকাম আয়াতসমূহ সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তারা হয়তো স্বয়ং মহানবী স.-এর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভের মাধ্যমে নয়তো বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের কাছ থেকে শুনে-শুনে শিক্ষালাভ করে এ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এসব শিক্ষক বা কুরআনের ধারকগণকে কুররা বা কারী বলে অভিহিত করা হত। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের পাঠক। প্রকৃতপক্ষে আরবরা ছিল সাধারণত উম্মি বা নিরক্ষর। লিখন-পঠনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। অতএব, তাদের মধ্যে যারা কুরআন পাঠ করতে পারতেন তাদেরকে অসাধারণ মনে করা হত এবং তারা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হতেন। সে জন্য তাদেরকে কারী অভিধায় অভিহিত করা হত।

ইসলামের সূচনালগ্নে এ রীতিই প্রচলিত ছিল। অতঃপর যখন ইসলামী রাষ্ট্র বিস্তৃত হয় এবং আরবদের অজ্ঞতার অবসান হয়, তখন আল্লাহর কিতাব তাদেরকে আলেমদের কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারা কিতাব থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবনের পন্থা শিখে ফেলেন এবং ফিকহ শাস্ত্র পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে যখন বিশেষ শাস্ত্র ও জ্ঞানের আকার ধারণ করে নেয়, তখন কারীদের পদবি ফুকাহা ও ওলামাতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এখান থেকেই ফিকহের দু'টি শাখার উদ্ভব ঘটে। এক ধরনের ফকিহ বা ফিকহবিদকে আহলে রায় ও আহলে কিয়াস (অর্থাৎ মতামতদান ও তুলনা করার অধিকারী) সাব্যস্ত হন। তাঁদের মধ্যে গণ্য হতেন ইরাকের অধিবাসী আলেমগণ। আর আরেক ধরনের ফকিহকে বলা হত আহলে হাদিস। তারা ছিলেন হেজাজের অধিবাসী। আমাদের বর্ণিত কারণে ইরাকবাসীদের কাছে হাদিসের সংগ্রহ ছিল তুলনামূলক কম। সুতরাং তারা কিয়াস বা তুলনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও খ্যাতি লাভে সমর্থ হন। সেজন্যই তাদেরকে আহলুর রায় নামে অভিহিত করা হয়।

ফিকহের মাযহাবসমূহ : কিয়াসের প্রবক্তাগণের মধ্যে যে পুরোধা ব্যক্তিত্বের ধারণা ও মতামত যথারীতি মাযহাব বা মতবাদের রূপ পরিগ্রহ করেছে তিনি হলেন ইমাম আবু হানীফা রহ.। তিনি এ ক্ষেত্রে অগ্রনায়ক ছিলেন। অন্য দিকে হেজাজে ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফিঈ রহ. ছিলেন ফকীহদের পথিকৃত। তাদের মাযহাবই সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। এরপর কিয়াসবিরোধী শ্রেণীর জন্ম হয়। তারা

কিয়াসমতে আমল করাকে সরাসরি গর্হিত সাব্যস্ত করেন। এ কিয়াসবিরোধীদেরকে বলা হয় জাহেরিয়্যাহ। তারা শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে সরাসরি কুরআন-হাদিসের নির্দেশ (নস) ও সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য (এজমা)-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেন। এমনকি সুস্পষ্ট কিয়াস ও নসের কারণকেও নসের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। এই জাহেরি মাযহাবের ইমাম ছিলেন দাউদ ইবনে আলী এবং তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ। সমগ্র মুসলিম উম্মাহর মধ্যে হানাফী, মালেকি ও শাফিঈ এ তিন মাযহাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করলেও আহলে বাইত তথা রাসূল আকরাম স.-এর বংশধরগণ পৃথক মাযহাব গঠন করে নেন। তাতে কোনো কোনো সাহাবীর সমালোচনা, ইমামগণের নিষ্পাপ হওয়া এবং তাদের বক্তব্যের অবিরোধযোগ্য হওয়ার মত বিষয় মৌলিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। অথচ এটা ছিল একান্তই অর্থহীন। তেমনিভাবে খারেজি সম্প্রদায়ও তাদের পৃথক ফিকহ রচনা করে নিয়েছিল।

অবশ্য মুসলিম উম্মাহ উপর্যুক্ত ফিকহ দুটিকে কোনো রকম গুরুত্ব দেননি, বরং সেগুলোর কঠোর সমালোচনা করেছেন। এছাড়া বিশেষ বিশেষ এলাকা ছাড়া যেখানে এসব মাযহাবধারীদের বসবাস ছিল অন্য কোথাও তাদের এ মাযহাবের কোনো নাম নিশানাও পাওয়া যায় না। উদাহরণত শিয়া ফিকহ শিয়া অনুসারী শাসকগোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত মরক্কো ও ইয়েমেনে সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তেমনি খারেজিদের ফিকহ ও মাযহাব তাদের রাষ্ট্রের ভেতরেই প্রচলিত ছিল। আর আহলে জাহের বা জাহেরিদের মাযহাব তো তাদের ইমামদের মৃত্যুর সাথে সাথেই ভূপৃষ্ঠ থেকে এমনভাবে মুছে গেছে যে, আজো পর্যন্ত তাতে আর প্রাণ সঞ্চার হয়নি। সেগুলো কেবল কিতাবাদিতেই লেখা রয়েছে, যা পোকার খোরাক হিসেবে হয়ে আছে। আজ যদি কোনো শিক্ষার্থী তাদের কিতাবাদি থেকে তাদের ফিকহ বা মাযহাব শেখার চেষ্টা করে, তাহলে সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না।

উপরন্তু এর মাধ্যমে সে উম্মাহকে যেন চ্যালেঞ্জ প্রদানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলো এবং উম্মাহর পক্ষ থেকে বেদআতি অভিধায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য হলো। বস্তুত ইবনে হাযমের সাথে তাই ঘটেছে। তিনি হাদিসের হাফেজ হিসেবে উচ্চমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু মাযহাব হিসেবে তিনি জাহেরিদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন এবং তাতে এমন ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে, এ দলের ইমাম দাউদের সাথেও মতবিরোধে প্রবৃত্ত হয়ে পড়েন। অপরদিকে মুসলিম ইমামগণের সাথেও তার খোঁচাখুঁচি চলতে থাকে। ফলে ফিকহের ইমামগণ তাকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেন এবং তার মাযহাবকে অসার প্রমাণ করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেন। ফলে আজ তাদের কিতাবপত্র কেউ স্পর্শ করে না।

ইদানীং কেবল দুটি মাযহাবই প্রচলিত রয়েছে। ইরাকে আহলে রায়ের মাযহাব আর হেজাজে আহলে হাদিসের মাযহাব। আহলে ইরাক বা ইরাকবাসীদের ইমাম ও মাযহাবের পথিকৃত ইমাম আবু হানীফা নোমান ইবনে সাবিত। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবস্থা এতই উচ্চে যে, সেখান পর্যন্ত পৌঁছা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকি তাঁর সতীর্থ মনীষীবৃন্দ বিশেষ করে ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম শাফিঈ রহ. পর্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন, ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর তুলনীয় ও তার সমকক্ষ আর কেউ নেই। অপরদিকে হেজাজবাসীর ইমাম ছিলেন মালেক ইবনে আনাস রহ. আসবাহী। যাকে দারুল হিজরা তথা মদিনার ইমাম বলা চলে। তিনি হুকুম-আহকামের অন্যান্য মূলনীতির সাথে সাথে মদিনাবাসীর আমল বা অনুশীলনকে বিশেষভাবে হুকুম-আহকামের প্রকৃত আদর্শ ও নীতি সাব্যস্ত করেছিলেন। কারণ, তিনি নিজের সময়কালের লোকদেরকে কর্মে ও বর্জনে নিজের পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেখেছিলেন। তিনি সেসমস্ত পূর্বসূরীগণের অনুগামী ছিলেন যারা স্বয়ং মহানবী স.-এর সাহচর্য লাভ করেছিলেন এবং সরাসরি তাঁর স. কাছ থেকে দীনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

মোটকথা, মদিনাবাসীর আমলকে তিনি মানদণ্ড সাব্যস্ত করে সেসবের ওপরই হুকুম-আহকামের ভিত্তি রেখেছিলেন। কেউ কেউ এমন বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, তিনি কেবলমাত্র মদিনাবাসীর ঐকমত্যকেই ইজমার মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই এমন ধারণার খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, ইজমার সম্পর্ক কেবল মদিনাবাসীর সাথেই নয়। বরং এটি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সাথে সম্পর্কিত। বস্তুত ইজমা হল কোনো দীনি বিষয়ের ওপর ইজতিহাদের আলোকে সমগ্র উম্মাহর ঐকমত্যের নাম। ইমাম মালেক রহ. এ অর্থে মদিনাবাসীর আমলকে আদৌ ইজমা হিসেবে গণ্য করতেন না। বরং তিনি মদিনাবাসীকে এতটুকু মর্যাদা দান করেছেন যে, যেহেতু মদিনাবাসী বছরের পর বছর ধরে মহানবী স.-এর জীবনকাল পর্যন্ত কোনো বিষয়ের গ্রহণ-বর্জনে অক্ষরে অক্ষরে নবীজির অনুসরণ করেছেন, সেহেতু সেসব ব্যাপারে তাদের ঐকমত্যও হয়েছে। বস্তুত সমস্ত উম্মতকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের অনুসরণ করা উচিত। তাছাড়া ঐকমত্য যেহেতু ইজমার ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে, সেজন্য এ অর্থে মদিনাবাসীর ঐকমত্যও ইজমারই অনুরূপ। আর এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি একে ইজমা অধ্যায়ে এনেছেন। অন্যথায় ইজমাতে কুরআন-হাদিস সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা ও ইজতিহাদের মাধ্যমেই ঐকমত্য হয়। পক্ষান্তরে মদিনাবাসীর ঐকমত্য গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে একান্তই দর্শননির্ভর ছিল; ইজতিহাদ বা অনুসন্ধাননির্ভর নয়। তারা প্রত্যেকটি বিষয়ে তাদের পূর্বসূরীদেরকে ধারাবাহিকভাবে

বিশেষ এক নববী পন্থা ও আদর্শের ওপর দেখেছেন এবং সে মোতাবেকই অনুশীলন করতে থেকেছেন। এভাবেই সেটি ঐকমত্যের আকার ধারণ করেছে। এ গ্রহণ-বর্জনের বিষয়টি যদি নবী কারীম স.-এর আমলের আওতায় বর্ণিত হতো কিংবা সাহাবায়ে কেরামের মাযহাবের আওতায় নিয়ে আসা হতো, তাহলে তাই উত্তম হতো। ফলে এটা নিয়ে কোনো রকম জটিলতা থাকত না।

ইমাম মালেক রহ.-এর পর ইমাম মোহাম্মদ ইবনে ইদরিস মুত্তালেবি শাফিঈ তার স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম মালেক রহ.-এর ওফাতের পর তিনি ইরাক যান এবং ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইরাকবাসী ও হেজাজবাসীর মাযহাবের সমন্বয়ে নিজের আরেকটি নতুন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইমাম মালেক রহ.-এর সাথে অনেক বিষয় বা মাসআলায় দ্বিমত পোষণ করেন। এ ইমামদ্বয়ের পরে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের আমল আসে। হাদিস শাস্ত্রে তার মর্যাদা ছিল অনেক ঊর্ধ্বে। তার শিষ্যগণ ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর শিষ্যগণের কাছ থেকে ফিকহ অধ্যয়ন করেন। হাদিসের ক্ষেত্রে স্বয়ং তাঁর মর্যাদা যথেষ্ট উঁচুতে থাকলেও একসময় তিনি হানাফী ফিকহেরই সমর্থক হয়ে যান। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের পর সমগ্র মুসলিম জাহানে তাকলিদের বলয় এ চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যান্য মাযহাবের অনুসারীরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই মাযহাব সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরাও ইজতিহাদের দাবী করে বসে এবং মুজতাহিদ হওয়ার চাতুর্যে লিপ্ত হয়। সে কারণে মুসলমানরা উল্লিখিত এই মুজতাহিদ চতুষ্টয়ের অনুসরণকেই জায়েয সাব্যস্ত করেন। এমনকি তাঁরা একথাও জায়েয মনে করেননি যে, একজনের অনুসরণ করার পর অপর কোনো ইমাম বা মুজতাহিদের অনুসরণ করা যাবে এবং এভাবে দীনকে খেলার বস্তুতে পরিণত করবে।

সেমতে এখন ফিকহের সারকথা (Extract) হল, বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সমস্ত ইমামের মাযহাবই বর্ণনা করা হবে, কিন্তু প্রত্যেক অনুসারী কেবল নিজের অনুসৃত ইমামের অনুসরণ করবে এবং মূলনীতির যথার্থতা ও রেওয়ায়াতে সনদের ধারাবাহিকতার প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখবে। বস্তুত এমন ইজতিহাদের পথ এমনভাবে বন্ধ হয়ে গেছে যে, এখন যদি কোনো লোক ইজতিহাদের দাবি করে, তবে তার সে দাবি তারই মুখের ওপর ছুড়ে মারা উচিত। কেউ তার অনুসরণ করবে না। সুতরাং সমগ্র ইসলামী জগতে বর্তমানে এই মাযহাব চতুষ্টয়ের প্রচলনই বিদ্যমান।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মুকাল্লিদ বা অনুসারীর সংখ্যা একান্তই অল্প। কারণ, তার মাযহাব ইজতিহাদ থেকে দূরে অবস্থিত এবং তার নির্ভরতা বহুলাংশে রেওয়ায়েত আখবারের ওপর, যেগুলোর একটি অপরটির সমর্থক। যাহোক, হাম্বলি

মাযহাবের যৎসামান্য অনুসারী কেবল ইরাক ও সিরিয়া এবং তার আশেপাশেই পাওয়া যায়। এরা হাদিস ও রেওয়ায়েতের ওপরই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফাহ রহ.-এর মুকাল্লিদ বা অনুসারী ইরাক, চীন ও ভারতীয় উপমহাদেশসহ পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত। এর বিস্তৃতির কারণ মূলত এই যে, একে তো এই হানাফী মাযহাব তৎকালীন ইসলামী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ইরাকে জন্ম লাভ করে, যার উচ্চমান ও জনপ্রিয়তা ব্যাপক হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তদুপরি ইমাম আবু হানীফার শিষ্যরা আব্বাসি খেলাফতের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপক আকারে গবেষণা, রচনা ও গ্রন্থনার স্তূপ তৈরি করে।

পাশাপাশি শাফিঈদের সাথে তাদের একাডেমিক বাহাস-বিতর্ক চলতেই থাকে এবং মূলনীতি শাস্ত্রে তাদের কলম থেকে অতি মূল্যবান আলোচনা-পর্যালোচনা বেরিয়ে আসে। এভাবে তারা জ্ঞানচর্চায় বিপুল গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভে সমর্থ হন এবং তাঁদের সে সমস্ত যশ-মহত্ব সহজে জনসম্মুখে প্রচার পায়। এছাড়া হানাফী মনীষীদের কিছু ইলমি (জ্ঞানগত) অবদান কাজী ইবনুল আরাবি ও আবুল ওয়ালিদ বাজির মাধ্যমে পশ্চিমেও বিস্তার লাভ করে। ইমাম শাফিঈর অনুসারী বেশীরভাগই মিসরে দেখা যায়। একসময় অবশ্য শাফিঈ মাযহাব ইরাক, খোরাসানসহ সাগরপাড়ের দেশসমূহেও বিস্তার লাভ করেছিল এবং ফতোয়া ও অন্যান্য বিষয়ের অধ্যয়নে শাফিঈরা হানাফীদের সাথে সমান অংশীদারিত্ব অর্জন করেছিল। যুগে যুগে তাদের মধ্যে বাহাস-বিতর্ক ও শাস্ত্রীয় আলোচনার সমাবেশ যথেষ্ট সরগরম থাকত। প্রত্যেক দলই বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ওপর যুক্তি-প্রমাণ সম্বলিত গ্রন্থাদি লিখে স্তূপ বানিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু একসময় যখন প্রাচ্যের ওপর দিয়ে ধ্বংসের ঝড় বয়ে যায় তখন যাবতীয় ইলমি উত্তাপ অতীত কল্পনায় পর্যবসিত হয়ে যায় এবং শাফিঈ মাযহাবও সেখান থেকে নির্বাসিত হয়ে যায়।

ইমাম শাফিঈ যখন মিসরে ছিলেন এবং বনি আব্দুল হাকামদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন, তখন বনি আব্দুল হাকামের একটি দল তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। আশহাব ইবনে কাসেম, ইবনে মাওয়ায সহ আরও কিছু বিশিষ্ট লোক বিশেষভাবে তার শিষ্যত্ব অর্জন করেন। অতঃপর হারেস ইবনে মিসকিন ও তার সন্তান-সন্ততিও তাঁর শিষ্যত্বের মর্যাদা লাভ করেন। তারপর মিসর যখন রাফেযি সম্প্রদায়ের অধীনে চলে যায়, তখন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ফিকহ নির্বাসিত হয়ে তদস্থলে আহলে বাইতের ফিকহ প্রভাব বিস্তার করে। তবে সালাহুদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়্যুবির হাতে রাফেযিদের শাসনের পতন ঘটলে সেখানে শাফিঈ ফিকহের পুনরুত্থান হয়। এবার তা আগের চেয়ে অধিক বিকশিত

হয়। সিরিয়ায় মুহিউদ্দীন নববী ও ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম খ্যাতির শিখরে পৌঁছে যান। এদিকে মিসরে ইবনুর রোকাআহ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাকিউদ্দীন ইবনে দাকীকুল ঈদ ও তাকিউদ্দীন সুবকিও তাঁদের যোগ্যতার পরিচয় দেন। এমনকি শায়খুল ইসলাম সিরাজুদ্দিন বুলকীনী খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেন। বলতে গেলে তাঁকেই সঠিক অর্থে শাফিঈ মাযহাবের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম গণ্য করা হয় এবং মিসরবাসী আজো তার জন্য গর্ববোধ করে।

ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাব পশ্চিমে ও মুসলিম স্পেনে বিস্তার লাভ করে। অন্যান্য এলাকায় যদিও মালেকি মাযহাবালম্বী লোক বসবাস করত কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল একান্তই অল্প। এর কারণ, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই পশ্চিম ও স্পেনবাসীর বিচরণ ক্ষেত্র হেজায পর্যন্ত সীমিত ছিল। এখানে এসেই তাদের যাত্রাবিরতি ঘটত। তখন মদিনা ছিল ইসলামী জ্ঞানের তীর্থস্থান। সেখান থেকেই সর্বত্র জ্ঞানের বিস্তার ঘটত। সুতরাং তিনি (ইমাম মালেক) ইসলামী জ্ঞান ও বিজ্ঞানের যে সেবাই করেছেন, তা হেজায থেকেই করেছেন। ইরাকের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেমতে ইমাম মালেক রহ.-ই তাদের শায়খে কামেল, ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন। তার আগে পশ্চিম ও স্পেনের অধিবাসীরা ইমাম মালেকের শায়খগণের সাথেই সম্পর্কিত ছিল। অতঃপর যখন তিনি ইলমের মসনদে আরোহণ করেন, তখন তারই হাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করেন। আবার তার ওফাতের পর তার শাগরেদগণকেই নিজেদের অনুসৃত সাব্যস্ত করে নেয়।

তাদের মালেকি মাযহাবলম্বী হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল এই যে, মরক্কো ও উন্দুলুসের (মুসলিম স্পেনের) অধিবাসীরা সাধারণত মরুবাসী বেদুইন শ্রেণীর লোক ছিল। ইরাকের সাংস্কৃতিক ও নাগরিক জীবনের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই ছিল না। এদিকে হেজাজেও বেদুইনত্বই ছিল মূল সংস্কৃতি। তাতে করে মরক্কো, স্পেন ও হেজাজের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গঠিত হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যায়, মালেকি মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় অনেকটাই নগরসভ্যতা ও নাগরিকত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল। যাহোক এখন যখন আলোচ্য চার মাযহাবই সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত হয়ে গেছে এবং প্রত্যেকটি মাযহাবই স্থায়ী অবস্থান গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইজতিহাদের দরজাও ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে, তখন অপরিহার্যভাবেই মাযহাব অনুসারীদের জন্য কোনো রকম সমস্যার ক্ষেত্রে তার সমাধানকল্পে মাসআলার বিশ্লেষণ, তুলনা ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে নতুন ইজতিহাদ ছাড়াই সেগুলোকে মূলনীতির আওতাভুক্ত করে নেয়া যায়। বলাবাহুল্য, এধরনের সমন্বয় ও তুলনা কোনো না কোনো মাযহাবে পরিপূর্ণ দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়। এরকম ব্যুৎপত্তি ও দক্ষতা অর্জনকেই বর্তমানে ফিকহ শাস্ত্র বলা হয়।

মরক্কোর অধিবাসীদের বলতে গেলে প্রায় সবাই ইমাম মালেক রহ.-এর মাযহাবের অনুসারী ছিল, কিন্তু তার শাগরেদগণ ইরাক ও মিসরেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন। যেমন, ইরাকে কাজী ইসমাঈল বা তার শ্রেণীভুক্ত ওলামায়ে কেরাম। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে খোয়াইয, ইবনে লুবান, কাজী আবু বকর, কাজী ইবনে হাসান ইবনে কাসসার ও কাজী আব্দুল ওয়াহহাব প্রমুখ। মিসরে ইবনে কাসেম আশহাব, ইবনুল হাকাম ও হারেস ইবনে মিসকীন কিংবা এদের পর্যায়ভুক্ত ওলামায়ে কেরাম ছিলেন। আব্দুল মালিক তাঁর দেশ স্পেন থেকে বেরিয়ে যখন ইবনে কাসেমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং জ্ঞানার্জনের পর পুনরায় স্পেনে প্রত্যাবর্তন করেন, সেখানে তিনি মালেকি মাযহাব বিস্তার করেন এবং এ মাযহাবের ওপর একখানি গ্রন্থ 'ওয়াযেহাহ' রচনা করেন। অতঃপর তার শাগরেদদের মধ্যে ওতবা কিতাবুল উৎবিয়াহ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

অপর দিকে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে আসাদ ইবনে ফুরাত প্রথমে ইমাম আবু হানীফার শাগরেদগণের বিদ্যায়তনে উপস্থিত হন। এরপর তিনি মালেকি মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইবনে কাসেমের কাছে মালেকি মাযহাব অধ্যয়ন করার পর 'আসাদিয়া' নামক কিতাব নিয়ে কায়রোয়ানে যান। এখানে 'সুহনূন' তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর সুহনূন ইবনে কাসেম থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। এরপর আমাদের সাথে অনেক মাসআলায় তার মতপার্থক্য হলে তিনি একটি কিতাব রচনা করেন। তাতে আসাদিয়ার মাসআলা যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি সেসব মাসআলাও যেগুলোতে সুহনুনের সাথে দ্বিমত করেছিল। কিতাবটি সুহনুন আসাদের কাছে পাঠিয়ে দেন যাতে তিনিও সে অনুসারে আমল করেন। এতে আসাদ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং একে নিজের জন্য একান্ত অপমানজনক মনে করেন। কিন্তু সেখাকার মানুষের আকর্ষণ সুহনুন-এর রচনার প্রতিই বেড়ে যায় এবং একেই তারা গ্রহণ করে নেয়। তাতে যেহেতু পরিচ্ছেদভিত্তিক মাসআলা বা বিষয় বণ্টনে প্রচুর সংমিশ্রণ ছিল, তাই তার নামকরণ করা হয়, 'মুদাওওয়ানা মুখতালাতা' (সংমিশ্রিত সংকলন)। যাহোক কায়রোয়ানবাসী এ সংকলনের দিকে ঝুকে পড়লেও উন্দুলুসবাসী 'ওয়াজেহা' ও 'উৎবিয়া'-কে গ্রহণ করে নেয়। পরে ইবনে যায়েদ মুদাওওয়ানার সারসংক্ষেপ লিখে তার নামকরণ করেন 'মুখতাসার'। আবার আবু সাইদ আল-বুরদুঈ এ সারসংক্ষেপেরও সংক্ষিপ্ত করে তার নামকরণ করেন 'তাহযীব'। সুতরাং তাহযীব হাতে আসার পর আফ্রিকার মাশায়েখগণ সেটিকে আমলে নিয়ে অন্যান্য রচনাবলি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে উন্দুলুসবাসী তাদের সমস্ত মনোযোগ 'উতবিয়্যার' ওপর কেন্দ্রীভূত করে এবং ওয়াজেহাকে উপেক্ষা করে। তখন থেকে সেখানকার

ওলামায়ে কেরাম এতদুভয় নির্ভরযোগ্য গ্রন্থেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা সংযোজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আফ্রিকাবাসীর ভেতর থেকে ইবনে ইউনুস নাকয়ি, ইবনে মোহাযযির তিউনিসি, ইবনে বশিরের মত আলেমগণ এ সংকলনের ওপর অনেক লেখালেখি করেন। অপর দিকে স্পেনবাসীর মধ্যে ইবনে রুশদ প্রমুখ উৎবিয়ার ওপর অনেক কাজ করেন। অতঃপর ইবনে আবু যায়েদ এসব কিতাবের সমস্ত মাসআলা-মাসায়েল একত্রিত করে একখানি সঙ্কলন প্রণয়ন করেন এবং তার নাম দেন 'আন্ নাওয়াদির'। এ কিতাবটি প্রকৃতপক্ষেই তার ব্যাপকতার দিক দিয়ে মালেকি ফিকহের একটি তুলনাহীন কিতাব। ইবনে ইউনুসও এ কিতাব থেকে অধিকাংশ বিষয় নিয়েই তাঁর সংকলন প্রণয়ন করেন। মোটকথা, কর্ডোভা ও কায়রোয়ানের পতন পর্যন্ত মরক্কো ও মুসলিম স্পেনে মালেকি মাযহাবের প্রচুর প্রভাব ছিল। বস্তুত আবু আমর ইবনে হাজেব মালেকি মাযহাব অনুসারীদের সমস্ত পথ ও পন্থাকে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে এবং যাবতীয় মতামতকে পৃথক পৃথক মাসআলার আকার দিয়ে বলতে গেলে মালেকি মাযহাবের এক অসাধারণ সূচি তৈরি করেন।

মিসরে মালেকি মাযহাবের প্রচলন হারেস ইবনে মিসকিন, ইবনে মোবাশশির, ইবনে লাইস, ইবনে রাশিক ও ইবনে শাশ প্রমুখের আমল থেকেই চলে আসছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় বনী আউফ ও বনী সাদের লোকেরা মালেকি মাযহাবে অনেক দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। ইবনে আতাউল্লাহও মালেকি ফিকহে বিরাট দক্ষ ছিলেন। আবু আমর ইবনে হাজের কার শাগরেদ ছিলেন একথা জানা যায় না। তবে একথা সত্য যে, ওবাইদী বংশের শাসন এবং আহলে বাইতের ফিকহের প্রচলনের অবসানের পর ফিকহে আহলে সুন্নাত যখন ফিকহে শাফিঈ ও ফিকহে মালেকির আকারে প্রকাশিত হয়, তখনই আবু আমরের আগমন ঘটে। সপ্তম শতকের শেষভাগে যখন তার কিতাব মরক্কো পৌঁছায়, তখন সেখানকার শিক্ষার্থীগণ বিশেষ করে বাজায়ার অধিবাসীরা সেটিকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। কারণ, পশ্চিমের সবচেয়ে বড় শায়েখ আবু আলী নাসির উদ্দিন যাওয়াদী মিসরে আবু আমর ইবনে হাজেরের শাগরেদদের কাছ থেকে ইলম আহরণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম সেখান থেকে তার কিতাবের সারসংক্ষেপ লিখে মরক্কো নিয়ে এসেছিলেন। তারপর তাঁর শাগরেদদের মাধ্যমে এ কিতাবটি এখানে প্রসার লাভ করে এবং এখানকার শিক্ষার্থীরা এর পঠন-পাঠনে নিয়োজিত থাকে এবং এরই ওপর নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। বলতে গেলে এর প্রসার শায়েখ নাসির উদ্দিনের প্রভাবেই হয়েছিল। নির্ভরযোগ্য আলেমগণ এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে ইবনে আব্দুস সালাম, ইবনে রুশদ ও ইবনে হারুন অগ্রগণ্য।

তৃতীয় : উসূলে ফিকহ

শরিয়াভিত্তিক শাস্ত্রসমূহের মধ্যে 'উসূলে ফিকহ' বা 'ফিকহের মূলনীতি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এটি শরিয়তের প্রাথমিক দলিলাদিতে প্রয়োগ করার জন্য এমনসব নিয়ম-পদ্ধতি প্রস্তুত করে যাতে বিধিবিধান উদ্ভাবন করা যায়। শরিয়তের প্রাথমিক দলিল হল আল্লাহর কিতাব কুরআনে হাকীম ও সুন্নতে রসূল বা হাদিস শরিফ। নবী কারীম স.-এর আমলে বিধিবিধান প্রাপ্তির উপায় ছিল এরকম, নবী কারীম স.-এর কুরআনের যেসব ওহী অবতীর্ণ হত, তিনি সরাসরি সেসব বাণী ও প্রয়োগপদ্ধতি বিশ্লেষণ করে দিতেন। একই রকম হুকুম বলে দিতেন। তাতে কোনো মুসলমানের বিচার-বিবেচনার কোনো প্রয়োজনই হত না। মহানবী স.-এর ওফাতের পর অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী উম্মাহর জন্য ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। অবশ্য মুসলমানগণ কুরআনকে আয়ত্ব করে নেয়। তা থেকে শরিয়তের বিধিবিধান জেনে নিতে থাকে।

কুরআনের পরের অবস্থান হলো নবী কারীম স.-এর সুন্নাহ। এর ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম ঐকমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, নবী কারীম স.-এর যে কথা ও কাজসমূহ আমাদের কাছে এমন পন্থায় পৌঁছে থাকবে, যার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের প্রবল ধারণা হবে সেগুলোর অনুসরণ করা অপরিহার্য। অর্থাৎ, প্রথমত শরিয়ত কুরআন ও সুন্নাহর ওপর নির্ভরশীল। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যকেও কুরআন ও সুন্নাহর পর্যায়ভুক্ত করা হয়। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম ইজমা বিরোধীদেরকেও ভর্ৎসনা করতেন।

বলাবাহুল্য, সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা ঐকমত্যও শরিয়তসম্মত কোনো যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতেই হতো। কারণ, সাহাবায়ে কেরামের মহত্ত্ব যখন প্রমাণিত, তখন তাঁরা কোনো যুক্তি-প্রমাণ ছাড়া কোনো বিষয়ে একমত হতে পারেন এ ধারণাই করা যায় না। ফলে অপরিহার্যভাবেই ইজমাও (অকাট্যতার বিচারে) কিতাব ও সুন্নাহ্র সমকক্ষতার মর্যাদা লাভ করে। এটিও শরিয়তের প্রাথমিক দলিল হিসেবে গণ্য হয়। সাথে সাথে আমরা আরও লক্ষ্য করি, সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী ওলামায়ে কেরামও দলিল-প্রমাণের ক্ষেত্রে এক বস্তুকে তার সমজাতীয় বস্তুর সাথে এবং দৃষ্টান্তকে সমকক্ষ দৃষ্টান্তের সাথে কিয়াস বা তুলনা করতেন। আর সেটা সবাই মেনে নিতেন। কারণ, মহানবী স.-এর ওফাতের পর এমন অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়, যে সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে শরিয়তের কোনো হুকুম বা নির্দেশনা জানা যায় না।

সুতরাং বাধ্য হয়ে পরবর্তী মনীষীদেরকে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত সুস্পষ্ট বিষয়াদির সাথে উদ্ভূত বিষয়গুলোকে তুলনা বা কিয়াস করতে হয় যাতে প্রতীয়মান হয়, এ তুলনামূলক

বিষয়ের মধ্যে প্রকৃতই সামঞ্জস্য রয়েছে কি-না এবং যাতে প্রবল ধারণা হতে পারে যে এর একটি বিষয়ে আল্লাহর যে হুকুম বা নির্দেশ রয়েছে, অপরটির ব্যাপারেও তাই হতে পারে। এটিই কিয়াসের লক্ষ্য। তাই এটি শরিয়তের প্রাথমিক দলিল প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত। সারকথা, শরিয়তের প্রাথমিক চার দলিল হল আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাহ, উম্মাহর ঐকমত্য (ইজমা) এবং কিয়াস। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মাযহাব তাই। অবশ্য কেউ কেউ ইজমা ও কিয়াসকে শরিয়তের প্রাথমিক দলিল বহির্ভূত গণ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ আরও দুটি এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেহেতু সেগুলো একান্তই বিরল, সেহেতু আমরা এ ব্যাপারে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না।

উসুলে ফিকহ বা ফিকহশাস্ত্রের মূলনীতিতে সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে যে, এচারটি বিষয়ই শরিয়তের দলিলস্বরূপ। এগুলোর মধ্যে কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন যেহেতু অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তাই এতে কারও কোন রকম কথা বলার এতটুকু সাহস নেই। এতে কোনো রকম সন্দেহ-সংশয়েরও অবকাশ নেই। তেমনি সুন্নাহ বা রসূলে করীম স.-এর হাদিসও সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্য পালনীয়। সেমতে মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় দেশের আশেপাশে যখনই বিধিবিধান বা আদেশ-নিষেধ সংবলিত কোনো চিঠি বা ফরমান পৌঁছাত, তখন সেগুলোকে অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করা হত। এগুলোর ব্যতিক্রম করার সাহস যেমন কারো হত না, তেমনি আজও প্রমাণিত সুন্নাহর মর্যাদা তেমনি রয়েছে। ইজমার গ্রহণযোগ্যতাও সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক প্রমাণিত। তারা ইজমার অস্বীকারকারীদেরকে ভর্ৎসনা করতেন। এটা যুক্তিসঙ্গতও বটে। কারণ, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যে যাবতীয় সমালোচনার ঊর্ধ্বে ও পূতপবিত্র ছিলেন, তা সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত। সুতরাং তাদের ইজমা বা ঐকমত্যের ব্যাপারে কোনো ঈমানদারই এতটুকু সন্দেহ-সংশয় করতে পারে না যে, শরিয়তসম্মত কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই তারা কোনো কথায় ও কাজে একমত হয়ে গেছেন। এখন রইল কিয়াসের প্রামাণ্যতা। বস্তুত কিয়াসের প্রামাণ্যতাও সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্যেই প্রমাণিত। সুতরাং এ রায়টিই শরিয়তের সর্বজনস্বীকৃত দলিল।

যেসব হাদিস নবী কারীম স. থেকে বর্ণিত সেগুলো মেনে নেয়ার পূর্বে এ বিষয়টি যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান করে নেয়া অপরিহার্য যে, এগুলোর বর্ণনা সূত্রগুলো কোন্ পর্যায়ের। রেওয়ায়েতগুলোর বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত কি না। এর মাধ্যমে হাদিসের যথার্থতা জানা যাবে। হাদিসের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলেই এ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় যে, এর কোন্‌টি 'নাসেখ' (রহিতকারী) আর কোনটি 'মানসুখ' (রহিত)। এসব পর্যালোচনার সাথে সাথে শব্দসঙ্কেতের প্রতি মনোনিবেশসহকারে লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। সেজন্য ফিকহের জ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র জানাও অপরিহার্য।

ইতিহাস বলে, যতদিন আরবরা নিজেদের ভাষা সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত ছিল, ততদিন না তাদের গঠিত কোনো শাস্ত্রের প্রয়োজন হয়েছে, না তারা শাস্ত্রের আলোকে বাক্যকে বুঝতে এবং না ফিকহ ইত্যাদি বিষয়ের মুখাপেক্ষী ছিল। যখন থেকে ভাষা সম্পর্কিত দক্ষতা বিদায় নিয়েছে, তখনই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যথাযথ উদ্ধৃতি ও তুলনার ভিত্তিতে ভাষারীতি প্রণয়নপূর্বক তাকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের আকার দান করেছেন। এ জন্য বর্তমানে শরিয়তের হুকুম-আহকামের পরিচিতি লাভের ক্ষেত্রে এসব শাস্ত্রীয় আইনসমূহের প্রতিও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

যাহোক, উসূলে ফিকহ বা ফিকহের মূলনীতি আসলে পরবর্তীকালের সৃষ্টি। পূর্ববর্তীগণ এর মুখাপেক্ষী ছিলেন না। শব্দের অর্থ জানার জন্য স্বাভাবিক ভাষা জ্ঞানের অতিরিক্ত তাদের কোনো বিষয়ের প্রয়োজন হত না। আল্লাহর বিধিবিধান উদ্ভাবনের জন্য বর্তমানে যেসব নিয়মকানুনের প্রয়োজন দেখা দেয় সেসবই তখন তাদের প্রকৃতিগত বিষয় ছিল। তেমনিভাবে হাদিসের সূত্র ইত্যাদি অনুসন্ধানেরও তাদের তেমন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তারা সবাই হয়তো রাসূল স. এর সমসাময়িক ছিলেন, অথবা নিকটবর্তী সময়ের লোক ছিলেন। তাতে হাদিস বর্ণনাকারীদের যাবতীয় অবস্থাই ছিল তাদের চোখের সামনে আয়নার মতো স্বচ্ছ। এখন যেহেতু পূর্ববর্তীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে; প্রথম পর্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং যাবতীয় শাস্ত্র সুসংহত হয়ে গেছে, সেহেতু ফিকহবিদ ও মুজতাহিদগণ প্রয়োজনীয় রীতি-নীতি ও আইনকানুন আয়ত্ত করার বিষয়টি অপরিহার্য বিবেচনা করলেন যাতে সেসবের আলোকে শরিয়তের প্রাথমিক দলিলসমূহের ভেতর থেকে বিধিবিধান উদ্ভাবন করতে পারেন। সেকারণে বর্তমানে এসব রীতি-নীতি ও আইন-কানুনই স্বতন্ত্র এক শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করেছে। তারই নাম উসুলে ফিকহ রাখা হয়েছে।

উসূলে ফিকহের প্রণয়ন

সর্বপ্রথম ইমাম শাফিঈ রহ. উসূলে ফিকহ বিষয়ে কলম ধারণ করেন এবং একখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক রচনা করেন। তাতে তিনি ইসলামের আদেশ-নিষেধ, কুরআন-হাদিস ও নাসেখ-মনসুখ (তথা রহিতকারী ও রহিত) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারপরে হানাফী ফিকহবিদগণ এক্ষেত্রে মনোনিবেশ করেন। তারা এর নিয়মবিধি ও পন্থা-পদ্ধতির ওপর বিশদ আলোচনা করেন। অন্যদিকে মুতাকাল্লিম (কালাম শাস্ত্রবিদ)-গণও এ বিষয়ে লেখালেখি করেন। তবে ফিকহবিদগণের আলোচনা ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ের সাথেই সম্পর্কিত থাকে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির উদ্ভাবনে সহায়ক হয়। কারণ, তারা প্রত্যেক মাসআলার আওতায় তুলনা ও দৃষ্টান্ত এবং যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তার বিশ্লেষণ করেন এবং সাথে সাথে ফিকহ সম্পর্কিত জটিলতারও সমাধান করতে থাকেন।

পক্ষান্তরে কালাম শাস্ত্রবিদগণ যখনই কোনো মাসআলার ওপর আলোচনা করেন, ফিকহ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি-প্রমাণের প্রতি ঝুঁকে পড়েন যা প্রকৃতপক্ষে এ শাস্ত্রেরই দাবী ও চাহিদা। যাহোক একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হয় যে, হানাফী ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। তারা ফিকহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিন্দুতে পৌঁছে গিয়ে ফিকহের মাসআলা-মাসায়েলের ভেতর থেকে উসূলে ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) সংক্রান্ত পন্থা-পদ্ধতি অতি দক্ষতার সাথে নিরূপণ করেন। এ শাস্ত্রে হানাফী ইমাম আবু যায়েদ দাবুসির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কিয়াস-এর ওপর এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে কিয়াস ও উসূলে ফিকহ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাহোক, উসূলে ফিকহের বিষয়গুলো সুসংহত ও সুবিন্যস্ত হয়েছে।

এছাড়া মানুষ মুতাকাল্লিমদের রীতিতেও এ শাস্ত্রের ওপর কলম ধরেন। এ ধরনের গ্রন্থাবলির মধ্যে সর্বোত্তম হল ইমামুল হারামাইন রহ.-এর রচনা 'আল-বুরহান' ও ইমাম গাযালি রচিত 'মুসতাসফা'। এ মনীষীদ্বয় ছিলেন আশ'আরি মতাবলম্বী। আর আব্দুল জাব্বার রচিত 'আল-আহদ' এবং আবুল হোসাইন বসরি প্রণীত 'শরহে আল আহদ'ও প্রশংসার যোগ্য। এঁরা দুজনেই ছিলেন মু'তাযিলা মতবাদের সমর্থক। এ রচনা চতুষ্টয় এমন উচ্চমর্যাদা লাভ করে যে, এ শাস্ত্রে (উসূলে ফিকহ) এগুলোকে আসল মূলনীতি গণ্য করা হয়। এরপর পরবর্তীকালের মুতাকাল্লিমগণের মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দিন ইবনে খতিব রচিত 'আল-মাহসুল'-এ এবং সাইফুদ্দিন আমিদি রচিত 'কিতাবুল আহকাম'-এ উল্লিখিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সারসংক্ষেপ প্রণয়ন করা হয়। তবে এ প্রণেতাদ্বয় গবেষণা পদ্ধতি ও পর্যালোচনা রীতিতে পরস্পরের ব্যতিক্রম ছিলেন। ইবনে খতিব কুরআন-হাদিসের উদ্ধৃতির ওপর জোর দিয়েছেন এবং তাতে দালিলিক প্রবণতা ছিল প্রবল। পক্ষান্তরে আমিদি ছিলেন মাযহাবের গবেষণায় অধিক মনোযোগী। তিনি মাসআলা-মাসায়েলের উদ্ভাবনের ওপর জোর দেন বেশি। পরবর্তীতে 'আল-মাহসুল'-এর সারসংক্ষেপও ইমাম ফখরুদ্দিনের শাগরেদ সিরাজুদ্দিন আরমভি 'আত-তাহসীল'-এ এবং তাজুদ্দিন আরমভি 'আল-হাসেল'-এ করেছেন।

এরপর শিহাবুদ্দিন কারাফি আলোচ্য গ্রন্থদ্বয়ের ভূমিকা ও রীতি-পদ্ধতি সমন্বয়ে অতি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এর নামকরণ করা হয় 'তানক্বীহাত'। তেমনিভাবে ইমাম বায়জাভি রহ. তার 'কিতাবুল মিনহাজ' গ্রন্থে একই রীতি অবলম্বন করেন। এই কিতাব দুটি প্রচুর পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে এবং অনেকেই এগুলোর ব্যাখ্যা রচনায় প্রবৃত্ত হন। এদিকে মাসআলা মাসায়েলের স্বচ্ছ গবেষণা সংবলিত আমিদি রচিত কিতাব 'আল-আহকাম' এর সারসংক্ষেপ আবু আমর

আল হাজেব 'মুখতাসারুল কাবীর' গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। এরও সংক্ষেপ করা হয়েছে অন্য আরেক পুস্তিকায়। সেটি শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিমের পাঠকরা একে যথেষ্ট গুরুত্ব দান করেন। অতি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সেটি আলোচনা ও পর্যালোচনা করেন এবং তার ভাল ভাল ব্যাখ্যা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বস্তুত হানাফী ফিকহবিদগণই উসূলে ফিকহ বিষয়ে অনেক বেশি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করেছেন এবং এ শাস্ত্রকে জনপ্রিয়তার শিখরে নিয়ে যান। পূর্ববর্তী মনীষীগণের মধ্যে আবু যায়েদ দাবুসির কিতাব সর্বোত্তম কিতাব হিসেবে বিবেচিত। আর পরবর্তী মনীষীগণের মধ্যে সাইফুল ইসলাম বযদভির 'কিতাবুল বযদভি' নামক গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। অতঃপর ইবনে সাআতীর সময় এলে তিনি 'কিতাবুল আহকাম' ও 'কিতাবুল বযদভি'কে একত্রিত করে 'বাদী'' নামে আরেকটি কিতাব প্রণয়ন করেন। 'বাদী' অর্থ অভিনব, অপূর্ব। এ কিতাবটি সত্য সত্যই এর নামের মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করে। কারণ এতে অভিনব গবেষণার সমাবেশ করা হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর ওলামায়ে কেরাম এটিকে তাদের পাঠ্যসূচিরও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষার্থী এর পঠন পাঠনে আগ্রহ পোষণ করেন। সুতরাং অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এর শরাহ বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং এর সূক্ষ্ম ও রসাত্মক বিষয়গুলোকে তুলে এনেছেন। বস্তুত এগুলোই উসুলে ফিকহের ওপর প্রসিদ্ধ রচনাবলি যেগুলোর কথা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।